আমার গানের নিমন্ত্রণ

- *মোঃ আনিসুর রহমান*
-

আমার সাম্প্রতিক সঙ্গীত জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি এই মনে করে যে আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দেশের নবীন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা কিছু চিন্তার খোরাক এবং দিক্-নির্দেশনা পেতে পারে । বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীর শ্রোতারা শিল্পীর কাছে কী প্রত্যাশা করছেন তার কিছু ইঙ্গিত।

১৯৯৭ (১).

আমি পেশাদার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নই, গান করি নিছক ব্যাক্তিগত আনন্দে, এবং যারা আমার গান শুনে আনন্দ পান তাঁদের আনন্দ দিতে। ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে ফরেন সার্ভিসের এক বন্ধুর বাসায় এক সন্ধ্যায় গান করেছিলাম প্রায় দুঘন্টা ধরে, সেখানে অন্যান্য শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনার দেবু মুখার্জি। গান শেষে দেবু মুখার্জি বলেন যে তিনি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, এবং এই অভিজ্ঞতা কলকাতায় নেবার ব্যবস্থা করবেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তিনি আমাকে ফোন করলেন ২৫শে বৈশাখ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে বাংলাদেশের অন্যান্য কযেকজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে আমাকেও গাইতে যেতে আমন্ত্রণ করতে। একটি বিশেষ সন্ধ্যা - ১১ই মে - শুধু বাংলাদেশী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক পশ্চিম বাংলা সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। আমি একটু ভয়ে ভয়েই রাজী হলাম, কারণ আমি তো পাবলিক গাইয়ে নই, আর অতো বড়ো মঞ্চে? কয়েকদিন পরে দেবু মুখার্জি আবার ফোন করে জানালেন যে আমি যখন যেতে রাজী হয়েছি তখন তিনি পশ্চিম বাংলা সরকারকে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করতে বলেছেন, এবং দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান হবে গিরিশ মঞ্চে। আমার তো আরো নার্ভাস হওয়া উচিত!

আমি কলিম শরাফির কাছে গেলাম। গিয়ে বল্লাম, ”কলিম ভাই, কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান হবে, সেখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে।” কলিম শরাফি বল্লেন, “তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর বক্তৃতা করবে?” আমি বল্লাম, “না, আমাকে গান গাইতে ডেকেছে”! তারপর বল্লাম, “আপনার পরামর্শ চাই। আমি তো পাবলিক সিঙ্গার নই, আর রবীন্দ্রসদনে গাইতে হবে, যেখানে আমি ঢাকাতেও কমপার‌্যাব্‌ল্ কোন স্টেজে কখনো গাই নি। তারপর তো নানারকম ঢাল-তলোয়ার থাকবে সেখানে, যেখানে আমি তো শুধু হারমোনিয়াম দিয়ে গাই। বলেন তো আমাকে কী এসব ঢাল-তলোয়ারের সঙ্গে গাইতে হবে? তাহলে তো ওখানে যাবার আগে আমার এসবের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে যাওয়া উচিত। কার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবো?”

কলিম শরাফি উত্তর দিলেন, “তুমি যেমন আছো তেমন থাকবে - কিচ্ছু বদলাবে না।” তাঁর এই কথা আমাকে সাহস দিল এবং মন ঠিক করতে সাহায্য করলো।

কলকাতার প্রোগ্রামে আমার সঙ্গে যান দেশের অগ্রণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বন্যা, সাদী, মিতা এবং আরো তিনজন। প্রথম দিনের রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানের আগের রাতে আমার অর্থনীতিবিদ্ বন্ধু অমিয় বাগচী ও তাঁর স্ত্রী রত্নার কাছে যাই তাঁরা আমার গান খুব পছন্দ করতেন। তাঁদের গোটা দশেক গান শুনিয়ে বলি আমার তো কলকাতার শ্রোতাদের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তাঁরা যেন আমার কয়েকটা গান বাছাই করে

দেন যেগুলি পরের দিনের অনুষ্ঠানে গাইলে ভালো হয়। রত্না আমার চারটি গান বাছাই করে দিলেন। তাদের মধ্যে প্রথমেই করতে বল্লেন "বঁধু মিছে রাগ কোরো না", এই বলে যে আমি যেভাবে সরাসরি বঁধুকে এই কথাগুলি বলি তাতে এই গানটা দিয়ে শুরু করলে সহজেই শ্রোতাদের মানভঞ্জন হয়ে যাবে।

পরের দিন অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা, বোধ হয় আমি সব চেয়ে সিনিয়র বলেই, আমাকে অনুরোধ করেন প্রথমে শোতাদের সঙ্গে আমার দেশের সব শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিতে। আমি আপত্তি জানাই এই ভেবে যে আমার দেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের কাকে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেব, কী বলতে ভুলে যাবো, তাতে কোনো অপরাধ হয়ে যেতে পারে এই ভেবে! তখন ওরা অনুরোধ করেন অন্তত: অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেরে শিল্পীদের সকলের পক্ষ হয়ে কিছু বলতে। আমি তাতে রাজী হলাম, এবং সবার হয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলাম। তাতে প্রথমে বল্লাম যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল অনেকগুলো আশা নিয়ে যাদের কোনটাই পূরণ হয় নি শুধুমাত্র একটি ছাড়া - সেই একটি হল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার অধিকার আদায় করা। তারপর আমার *অসীমের স্পন্দ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা* বইটা হাতে নিয়ে তার মলাটের ভেতরের পাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যে দশটি বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া আছে সেগুলির, কার্ল মার্কসের "টেন্ থিসিস অন ফুয়েরবাক" এবং বাইবেলের "টেন কমান্ডমেন্ট"-এর সঙ্গে তুলনা করে, ব্যাখ্যা দিলাম, যেগুলির মধ্যে কবি তাঁর গানের গায়কীতে শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা চেয়েছেন, "তখন তখনি জীবন-উৎস থেকে তাজা হয়ে ওঠা" গান চেয়েছেন, নির্জীব অনুকরণ চান নি।

তারপরে হারমোনিয়াম টেনে নিলাম গান করবার জন্য। আশেপাশে একদল যন্ত্রী নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে স্টেজ জুড়ে বসেছিলেন, তাঁদের বল্লাম "আমি শুধু হারমোনিয়ামের সঙ্গে গাই সেভাবেই গাইব, আপনারা নীচে নেমে বসে গান শোনেন গিয়ে"। তাঁরা নীচে নেমে গেলেন। আমি শ্রোতাদের সম্ভাষণ করে বল্লাম যে আমি পেশাদার গাইয়ে নই, একেবারে নিজের আনন্দে গাই, এবং রবীন্দ্রনাথের গানের অপার সৌন্দর্য ধরতে চেষ্টা করি কিন্তু ধরতে পারি না, তাঁদের শুধু আমার চেষ্টাটাই দেখাব।

প্রথমে রত্নার সিলেকশন থেকে তিনটি গান করলাম। গান তিনটি শেষ করে শ্রোতাদের সালাম দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, সবাই "আরেকটা, আরেকটা" করে হৈ হৈ করে উঠলেন। আমি বল্লাম যে আরো ছয়জন আমার দেশের শিল্পী গাইবেন, আমার আর গাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু শ্রোতারা ছাড়লেন না, আমাকে আর একটা গান গাইতে হোল।

এরপর বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পীরা এক এক করে গাইলেন। সবার গান শেষ হলে আমি আবার স্টেজে ঢুকি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে। তখন শ্রোতাদের কাছ থেকে ভীষণ করতালি পাই। অনুষ্ঠান শেষে আমি যখন স্টেজ থেকে শ্রোতাদের সামনে নামি তখন লম্বা সারি করে বহু শ্রোতা আমার সঙ্গে হাত মিলাতে বা আমাকে প্রণাম করতে আসেন (পশ্চিম বাংলায় মুরুব্বীদের ভীষণ প্রণাম করে!) এবং গান ভীষণ ভালো লেগেছে বলেন। এঁদের মধ্যে একজন মা তাঁর টীন-এজ্ কন্যাকে আমার কাছে টেনে এনে তাকে বলেন আমাকে প্রণাম করতে, এবং আমাকে বলেন, "আমার মেয়ে গান শিখছে, আপনি এর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুণ, না হলে এর গান হবে না!"

আমার আরো বড়ো পাওনা ছিল যে-যন্ত্রীদের আমি আমার সঙ্গে বাজাতে দিই নাই নীচে নামিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছ থেকে। সবার সঙ্গে হাত মিলানো ইত্যাদি শেষ হলে যখন হোটেলে ফেরবার জন্য গাড়ীতে উঠতে গাড়ীর দরজা খুলেছি, তখন সব যন্ত্রীরা আমার কাছে এসে হাজির। তাঁদের মধ্যে

একজন আমার সামনে এসে বল্লেন "আমাদের দাদা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।" 'দাদা' অর্থাৎ ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ বেহালা বাদক আমার সামনে এসে তাঁর দুটো হাত দিয়ে আমার দুটো হাত ধরলেন, আমার গানের অত্যন্ত তারিফ করলেন, এবং বল্লেন, "কালকে গিরিশ মঞ্চে আমরা আপনার সঙ্গে বাজাতে চাই, আমরা আপনার গান নষ্ট করবো না, আমাদের প্লীজ্ আপনার সঙ্গে একটু বাজাতে দিন।" তাঁর এই অমায়িক কথায় আমি মুগ্ধ হলাম, বল্লাম, "আপনারা এমন করে যখন বলছেন তখন নিশ্চয় কালকে আমার সঙ্গে বাজাবেন, তবে আমি বল্ছি কী কী যন্ত্র নেব - আমি এস্রাজ নেব, বেহালা নেব, আর মন্দিরা দিয়ে ছন্দ নেব, তবলা নেব না।" যন্ত্রীরা মহাখুশী হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

সেই রাতেই হোটেলে আসেন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বর্তমানে প্রয়াত অর্ঘ্য সেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দেখেই তিনি বলেন, "আপনি তো বেশ করলেন, দিব্যি তবলা ছাড়া গেয়ে দিলেন, খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু আমরা তো সাহস করবো না" । আমি বল্লাম, "ভালো লাগলে সাহস করবেন না কেন?" তিনি বল্লেন, "আমাদের তো রুজির কথা ভাবতে হয়, আপনার তো সেই চিন্তা নেই।" অর্থাৎ 'বাজারের' কথা ভাবতে হয় - কী দুর্ভাগ্য! অর্ঘ্য সেন অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন, এবং আমাকে বেশ অপ্রস্তুত করে আমাদের মধ্যে একজন নবীন শিল্পী যাকে তিনি আগে থেকে চিনতেন তাকে অনেকক্ষণ উপদেশ দেন যেন যান্ত্রিকভাবে সুর না গেয়ে আমার মতো একটু হোম্ওয়ার্ক করে গানের কোন্ কথাগুলি কীভাবে বলবে তা তৈরি করবার জন্য।

পরের দিন গিরিশ মঞ্চের অনুষ্ঠানে আমার গানের সঙ্গে এসরাজ, বেহালা ও মন্দিরা শিল্পীরা অত্যন্ত যত্ন করে সঙ্গত করেন আমার কণ্ঠের ওঠানামা খেয়াল করে, এবং আমি তাঁদের সঙ্গে গেয়ে অত্যন্ত আরাম বোধ করি। আমাদের সকলের গান শেষ হলে পশ্চিম বাংলা সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর কবি কালীকৃষ্ণ গুহ একেবারে দুহাত বাড়িয়ে স্টেজে এসে আমাকে বলেন, "এই তো, এইরকম গানই তো আমি অনেকদিন ধরে চাইছি, তবলা বাদ দিয়ে অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে, মন্দিরা দিয়ে ছন্দ দিয়ে।" আর এক জন মহিলা স্টেজে উঠে এসে তাঁর পরিচয় দেন - রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চিত্রলেখা সেন, এবং বলেন যে আমার গাওয়া "একদা তুমি প্রিয়ে" গানটি তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছে।

পরের দিন সকালে হোটেলে এক মহিলার টেলিফোন পাই। বাংলা সাহিত্যে সদ্য পাশ করা এম,এ। বল্লেন আমার "একদা তুমি প্রিয়ে" গানটি এমন করে তিনি কোনদিন শোনেন নি। বল্লেন তিনি শুনেছেন দু দিন পর আমি টাগোর রিসার্চ ইন্সটিট্যুটে গান করবো,তিনি সেখানে যাবেন, এবং আমি যদি কথা দিই সেখানে এই গানটি আবার করবো তাহলে তিনি সেখানে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। এরকম রোমান্টিক কথা শুনে আমি তাঁকে ওই গানটি আবার করবো এই কথা না দিয়ে কী পারি?

দু দিন পর বিকেলে টাগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে আমার গানের আসর হয় এবং সেখানে "একদা তুমি প্রিয়ে"-পাগল সেই মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তিনি আমার কলকাতার সঙ্গীতের আসরের একজন স্থায়ী শ্রোতা হযে যান। আর টাগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের ডেপুটি ডিরেক্টর (ডিরেক্টর ছিলেন না) আমার গানের শেষে আমাকে করমর্দন করে বলেন যে তিনি আমাদের রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে ছিলেন, এবং যোগ করেন, "আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে রবীন্দ্রসদনের শ্রোতারা আপনার গান পছন্দ করেছে।"

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের বন্ধুরা আমাকে তাদের একটি বিশেষ মূল্যবান প্রকাশনা উপহার দেন - *রবীন্দ্রসংগীত: প্রয়োগ ও পরিবেশন আলোচনা চক্র,* রবীন্দ্রচর্চাভবন, ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯১। এতে শ্রী ভি বালসারার লেখা "রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার" -শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবির গানে তবলার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনাটি আমার দর্শনের সঙ্গে (এবং বলা বাহুল্য কবির নিজের লেখা "সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে) মিলে যায়, যেমন এই কথাটি:

"রবীন্দ্রসঙ্গীত ভায়ায় ও ছন্দে সম্পূর্ণ। গান আরম্ভ হলেই তার ছন্দের দোলা এব"ং বক্তব্যের পূর্ণ নিস্পত্তির ইঙ্গিত স্থায়ী অংশেই বোঝা যায়। সুতরাং তবলা বাজিয়ে ছন্দের দোলাকে ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন বোধ করি নিস্প্রয়োজন। ..." (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫)। শ্রী বালসারা বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত মধ্যলয়ের ভাবসমৃদ্ধ গানে তবলার সঙ্গতের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন তবলার "সোচ্চার ধ্বনি" এরকম গানের রসকে নষ্ট করে দিতে পারে বলে।

১৩ই মে আমার কলকাতার স্কুলের বন্ধু 'সমতট' পত্রিকার সম্পাদক অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত-এর বাসায় গান করছিলাম, সেখানে ছিলেন সমতট পত্রিকা বোর্ডের সভাপতি প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায় ওরফে 'যাযাবর' । পঞ্চাশের দশকে যাযাবরের লেখা প্রথম বই *দৃষ্টিপাত* পড়ে তাঁর অসামান্য লেখবার স্টাইলে কে না মুগ্ধ হয়েছিল - আমরা যারা তখন ছাত্র ছিলাম তাদের হাতে হাতে ঘুরতো এই বইটি। বহু বছর পরে একেবারে চাক্ষুস যাযাবরকে দেখে - তাঁর বয়স তখন আশির কাছাকাছি -, এবং আরো বেশি তাঁকে গান শোনাবার স্যেভাগ্য হাতে পেয়ে আমি প্রাণ ভরে কয়েকটি গান গাই। গান শেষ হলে যাযাবর বল্লেন আমাকে তাঁর বাসায় এক সন্ধ্যায় গান করতেই হবে। আমি বল্লাম সানন্দে করবো, তবে এক সর্তে - তাঁকে আমার গান সম্বন্ধে কয়েক লাইন মন্তব্য লিখে দিতে হবে। যাযাবর রাজী হলেন।

১৫ই মে যাযাবরের বাসায় আমি গান করি, শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু। যাযাবর আমাকে এক পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখে দেন যা থেকে কয়েকটি লাইন নীচে উদ্ধৃত করলাম:

> *"তাঁর কন্ঠে এমন একটি আন্তরীক আবেদন আছে যা অনায়াসে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। কবির কথারই সামান্য অদল বদল করে বলতে পারি - আনিসুরের গানের আসরে একজন গাহিছে খুলিয়া গলা, অন্যেরা গাহে মনে মনে। তাই গান শেষ হলেও গানের রেশ জেগে থাকে শ্রোতাদের কানে কানে। ঐখানে তাঁর সাফল্য"* - বিনয় মুখোপাধ্যায়, ১৫/৫/৯৭।

১৬ই মে আর একটি বাসায় একটি বড়ো আসরে গান করি, প্রায় দেড় ঘন্টা। সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে সেই বাংলা সাহিত্যের এম,এ ভদ্রমহিলাও ছিলেন । আমি যখন শেষ গানের ঘোষণা দিয়ে গানটি শুরু করতে যাই তখন সেই ভদ্রমহিলা বল্লেন, "আপনি 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটি গাইবেন না? আমি যে ওটা শোনবার জন্য বসে আছি।" গানটি আবার গাইলাম। মনে পড়লো আশীর দশকে জেনেভায় প্রথম এই গানটি স্বরলিপি থেকে তুলে যখন গাইতে শুরু করি সেখানেও একজন মহিলা ঠিক এইরকমই তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতেন কখন এই গানটি গাইব, এবং কোনো আসরে এটি না গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতে গেলে ঠিক এমনি করেই বলে উঠতেন, "ওই গানটি গাইবেন না? আমি যে ওটা আবার শোনবার জন্য বসে আছি!" সেই মহিলার জন্য প্রত্যেকটি আসরে এই গানটি আমাকে গাইতেই হতো।

এই গানটি আমার এই স্মৃতিচারণে আবার ফিরে ফিরে আসবে।

দেশে ফেরবার কযেক সপ্তাহ পর কলকাতা থেকে এক বন্ধু ১৮ই জুলাই-এর স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় আমাদের রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানের রিভ্যু পাঠিয়ে দেয়। তাতে রিভ্যুয়ার লিখেছিলেনঃ

“Anisur Rahman’s discipline is economics but his passion is Rabindrasangeet. It has dominated his thoughts in a way that is rare even among practitioners of Rabindrasangeet...His unpretentious style moved the audience who encored him vociferously. His “Saghono gahono ratri” and “Eshechile tobu asho nai” were warm and intimate.”

এ ছাড়া রিভ্যুয়ার প্রশংসা করেছিলেন বন্যা ও মিতা হকের গান। পড়ে ভালো লেগেছিল। একজন বাংলাদেশী শিল্পীর গানের কঠোর সমালোচনা করেছিল নাম না বলে একথার উল্লেখ করা প্রয়োজন সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যঃ

“The big disappointment was ... whose recital was totally marred by her indiscriminate pauses for breath and her straying away from standard notations.”

আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্রিকাতেই সঙ্গীত রিভ্যুয়ার বলতে তেমন কেউ নেই, মনে হয় গানের প্রশংসা হয় মোটামুটি অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা দেখে। এতে কণ্ঠশিল্পীদের টেক্নিকাল বা অন্যান্য দোষ-ত্রুটি তাকে ধরিয়ে দেয়া হয় না, যা তাদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উল্লিখিত শিল্পী এদেশের একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষকের ছাত্রীও বটে যাঁরও দায়িত্ব শিষ্যের দোষত্রুটি ধরিয়ে দেয়া। বিদেশের পত্রিকায় আমাদের একজন পূরোভাগের শিল্পীর এরকম সমালোচনা পড়ে বড়ো কষ্ট হয়েছিল।

১৯৯৭ (২)

জুলাই মাসেই আবার ভারতীয় হাই কমিশনরের ফোন আসে বাইশে শ্রাবন উপলক্ষেও কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এবার আমন্ত্রণ আসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর একটি বক্তৃতা দিতে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত, আর আধ ঘন্টা গান করতে। আমি জানাই যে আমি ৪৫ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবো না, ২০ মিনিট বক্তৃতা দেব। আরো জানাই যে আমি বৃদ্ধ, এবং প্রায়ই সর্দি-কাশি হয়, অনুষ্ঠানের তো আরো কয়েক সপ্তাহ আছে সেসময় শরীর কেমন থাকে তা তো বলা যায় না, তাই আরো দু-তিনজন শিল্পীকেও আমন্ত্রণ জানানো ভালো যাতে আমার কণ্ঠ পদে না থাকলেও অনুষ্ঠান নষ্ট না হয় । আমার সাবধানবাণীর জন্য কলকাতা থেকে সুবিনয় রায় এবং অর্ঘ্য সেনকেও এই অনুষ্ঠানে গাইতে আমন্ত্রণ করা হয়।

আমার কাছে ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছ থেকে আরো বার্তা আসে পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন আমি যেন এবার রবীন্দ্রসদনে “একদা তুমি প্রিয়ে” গানটি করি

- তিনি আগেরবার গিরিশ মঞ্চের অনুষ্ঠানে ছিলেন না, এবং কোন্ ‘প্রিয়ের’ কাছ থেকে কে জানে আমার এই গানটির বিশেষ প্রশংসা শুনেছেন!

এবার রবীন্দ্রসদনে ৭ থেকে ১০ই আগষ্ট চারদিনব্যাপী রবীন্দসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। আমি এবং ঢাকা থেকে আর এক জন শিল্পী ১০ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করি। সুবিনয় রায় আসতে পারেন নি অসুস্থতার জন্য, তাঁর স্থানে এসেছিলেন পীযুষ কান্তি রায়। আর সৌভাগ্যবশতঃ আমার কণ্ঠ পদেই ছিল।

আমি আয়োজনমতো প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর ২০ মিনিটের একটি বক্তৃতা দিই। বক্তৃতাটি ছিল এইঃ

রবীন্দ্র সঙ্গীতে ‘রসের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম’

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী নিয়ে অনেক মত আছে, শক্ত-নরম অবস্থান আছে, অনেক মতভেদ আছে। এ প্রশ্নের মীমাংসা দেওয়ার জন্য কবিও আজ নেই, কাজেই মীমাংসা বোধ হয আর হওয়ার নয়। তবে এ প্রশ্নে কবির নিজের বিভিন্ন লেখা, আলাপ-আলোচনা এবং তাঁর গান থেকেই যে সমস্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে ভাববার বিশেষ মূল্য আছে।

প্রায় শেষ বয়সে দিলীপ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় কবির আক্ষেপটি চমকে দেওয়ার মতোঃ
“গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিযে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না।... আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে। একটি মাত্র মেয়েকে জানতুম যে আমার গানের মূল সুরটি ধরতে পেরেছিল সে হচ্ছে ঝুনু, সাহানা।” (‘আলাপ-আলোচনা’, সঙ্গীত চিন্তা)।

সে সমযকার গায়ক-গায়িকারদের গান বিশ্লেষণ করবার জন্য উপযোগী রেকর্ড তেমন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রোত্তরকালে বেশ কয়েকজন শিল্পী আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসাধারণ পরিবশেনা উপহার দিয়েছেন। তাদের গায়কী সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে ও নিবেদনের মাধুর্যে মনোহর। পঞ্চাশ-ষাট দশকে এই পরিবশনা একটা পরিণতি লাভ করে,, হয়তো তাকে একটা রেঁনেসা বলা যায়। এতে যে শিল্পীরা পুরোভাগে ছিলেন তাদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় ও কলিম শরাফীর নাম সহজেই মনে আসে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এদের নিবেদনের পূর্ণতা কবি দেখে যাননি। তাই আমাদের জানবার উপায় নেই এঁদের কার গান তাঁকে কতোটা পরিতৃপ্তি দিতে পারতো।

তবে তাঁর গানের পরিবেশনারয় যে জিনিসটি তিনি চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কবির নিজেরই লেখা ও কথা থেকে এবং তাঁর গানের মধ্যেই গানের বর্ণনা থেকে আমরা বেশ কিছু ইঙ্গিত পাই।

বলাই বাহুল্য কবি শুধু সুর-তালে সমৃদ্ধ সুকণ্ঠে গীত গান চাননি, আরো অনেক গভীর কিছু চেয়েছেন।

কবি যে গায়কের কাছে তার বাণীর মর্যাদা চেয়েছেন এ কথা সবারই জানা। তাঁর গান কাকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন এই প্রশ্ন করে তাঁর নিজেরই কবিতায় উত্তরঃ

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কীর ক্ষেত্রে এর অর্থ অবশ্যই এই যে, কবির গান শুধু লয়-তালে সুর গাওয়া নয়, গানের কথাটি বলা। কিন্তু বলতে হবে গদ্যেও নয়, পদ্যেও নয়, সঙ্গীতেই। সঙ্গীত সম্বন্ধে কবির ধারণা কেমন ছিল?

কবি তাঁর গানে সুর ও ছন্দ (তাল, কিন্তু শাস্ত্রীয় অর্থে অর্থাৎ সম-ফাঁক নিয়ে তাল নয়) নিজেই দিয়েছেন, কিন্তু শুধু সুর ও ছন্দ দিয়ে সে সঙ্গীত হয় না এ কথাও তিনি নিজেই বলেছেন: 'সুর-তালে ব্যাপ্ত হযে থেকে সুর-তালের অতীত যা, তাই সঙ্গীত'।

সুর-তাল ছাড়িয়ে সঙ্গীতের এই ট্রানসেন্ডেন্টাল চরিত্রটি স্বরলিপিতে দেখানো যায় না, কিন্তু সঙ্গীতের আসল জিনিসটি এখানেই। এখানেই গায়ক শুধু গায়ক না হয়ে শিল্পী, এবং এখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীত একটি শিল্প, শ্রোতাদের একটা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যালোকে নিয়ে যায়, যা সৃষ্টির ব্যাপার, লীলার ব্যাপার, কোনো কারিগরি ব্যাপার নয়।

আমার মনে হয়েছে, আমরা অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নটিকে তেমন গুরুত্ব দিইনি। অনেকে মনে হয় এ রকম প্রশ্ন তুললে ভয়ই পেয়ে যান তাহলে কি সুর নিয়ে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে? আমার আজকের আলোচনা এই প্রশ্ন নিয়ে নয়। আমরা জানি যে এই প্রশ্ন দিলীপ রায় কবিকে করেছিলেন, কবি প্রথমে প্রবল আপত্তি করেছিলেন, পরে মেনেছিলেন যে তাঁর অনেক গানে স্বাধীনসুরবিহারির সুযোগ আছে, তবে বলেছিলেন তা যেন সত্যিকার প্রতিভাবান গায়ক ছাড়া অন্যে চেষ্টা না করেন, এবং সুরবিহার যেন গানের কাব্যরসকে ক্ষুণ্ন না করে। এই প্রশ্নের কিছু আলোচনা আমি আমার 'অসীমের স্পন্দ' (ইউপিএল ঢাকা ও 'নয়া উদ্যোগ' কলকাতা) বইতে করেছি। কিন্তু এই প্রশ্ন বাদ দিয়ে, কবির দেয়া সুরের গন্ডীর মধ্যে থেকেও যে গায়ককে স্রষ্টা হতে হবে এটিও যে করিরই পরম আকাঙ্খা ছিল, এই কথাটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত এপ্রিসিয়েশনে তেমন মূল্য পেয়েছে বলে আমার মনে হয়নি।

এ সম্বন্ধে কবির নিজের চিন্তা ও বক্তব্য আমার কাছে সব সময়েই দ্বিধাহীন ও স্পষ্ট মনে হয়েছে। কবি সব সময়েই মানুষের মূল পরিচয়ই দেখেছেন স্রষ্টা হিসাবে, শুধু গানের ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই (তাঁর কালান্তর এবং অন্যান্য বহু লেখা থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট)। আর গানের পরিবেশনায় তিনি যে সৃষ্টিশীলতা চেয়েছেন তারও অনেক পরিচয় রয়েছে তাঁর লেখা ও আলোচনায়, যার থেকে এখানে শুধু দুটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হতে পারে। একটি হলো তার 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে: 'যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম।'

আর একটি হলো কবির সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী সাহানা দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে: 'তুমি যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে... সে গানে আমি যতখানি আছি ততখানি ঝুনুও আছে... এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।'

একই কথা, একটি তত্ত্বগতভাবে আরেকটি ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন কবি। এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন হওয়ার কথা নয় যে কবি তার গানের পরিবেশনায় গায়ককে স্রষ্টা হতে, শিল্প সৃষ্টি করতে, আমন্ত্রণ করছেন; এবং এ রকম গায়কের গলায় মালা দেওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। গানের সুর কবি বেঁধে দিয়েছেন বলে শিল্পসৃষ্টির জায়গা নেই, বা এমনকি বিশেষ কম আছে, এ রকম কথা আশা করি কেউই বলবেন না। প্রত্যেক গানে রচয়িতার সৃষ্ট সুরের একটা পথরেখা থাকে যা এক সুর থেকে আর এক সুরে যাওয়-আসা নির্দেশ করে, কিন্তু একই সঙ্গে গানে সুরের গতিময়তা বা ডাইনামিজম - জীবন্ত বিহার - থাকে। তাসের দেশ-এর 'তোলন-নামন পিছন সামন বাঁয়ে ডাইনে চাইনে চাইনে' জাতীয় 'গান' ছাড়া কোনো গানেই সুর সমতল পথে (এক ওজনে, ভল্যুমে) হেঁটে বা গড়িয়ে এক পরদা থেকে আর এক পরদায় যাওয়া আসা করে না, থ্রি ডাইমেনশন স্পেসে ভেসে বয়ে নেচে চলে যে গতিময়তা টু-ডাইমেনশনাল স্বরলিপিতে ধরা যায় না। স্বরলিপি টু-ডাইমেনশনাল প্লেনে এই গতিময় গানের প্রজেকশন মাত্র, যার মধ্যে গানের জীবন্ত প্রবাহের অনেক (অধিকাংশ) উপাদানই থাকে না। (পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশনে গানের গতিময়তার কিছু উপাদান দেখাবার চেষ্টা করা হয় যা আমাদের স্বরলিপিতে সাধারণত: দেখানো হয় না)।

গানের এই গতিময়তা সম্বন্ধে যে কবি নিজে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন শুধু তা নয়। এর মধ্যেই যে তিনি গানের সৌন্দর্যের এবং গানের আবেদনের অনেকখানি উপাদান দেখেছিলেন, একথাও স্পষ্ট তাঁর নানান লেখার এবং তাঁর অসংখ্য গানেরই চরণে চরণে যেখানে তিনি গানেরই রূপ বর্ণনা ও তার বন্দনা করছেন। উদাহরণস্বরূপ: 'আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সঙ্গীতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়' (সঙ্গীত ও ভাব')।

কবির গানের চরণে সঙ্গীতের চরিত্রের বর্ণনা ও বন্দনার দৃষ্টান্ত: 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়...', 'গানের ঝরনাতলায়....', 'সুরের হাওয়া চলে গগণ বেয়ে', 'বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী'', 'আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া', 'দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে'।

সুরের এ রকম প্রবাহে কবি দেখেছেন সুরের 'দোলা', সুরের 'হিল্লোল', সুরের 'উচ্ছ্বাস'। আরো যে রকম ভাষায় তিনি এই সুরপ্রবাহের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করেছেন তার কয়েকটি নমুনা হলো: 'সুরের আগুন'; 'সুরের হোমানল'; 'সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে'; 'সুরের আবীর হানব হাওয়ায়'; 'সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদঘাটিত হইতেছিল। 'এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধুমের মতো আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে।'

এগুলো কবির কবিকল্পনা হলেও বিভিন্ন সময়ে রচিত বিভিন্ন গানে ও অন্যান্য রচনায় এ রকম বিভিন্ন কল্পনায় যে সঙ্গতি দেখা যায় তা থেকে কবির মানসে সুরের একটি স্বকীয় প্রবহমান গতিশীল চরিত্র ইঙ্গিত করে। এই প্রবাহ ঢেউয়ের মতো, বাতাসের মতো, আলোর মতো, আবীরের মতো, ধূপের ধোঁয়ার মতো, বয়ে যায়, উঠে যায় বা ছড়িয়ে যায়, আসে বা মিলিয়ে যায়। এই প্রবাহ নিজের আবেগে উঠে-নামে, যখন আবেগ প্রবল হয় তখন চপল ঢেউয়ের মতো হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, আকুল তালে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ঝড়ের হাওয়ার মতো উড়িয়ে দেয়, প্লাবনের মতো ভাসিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে কবির কাছে সঙ্গীত একটি তরঙ্গপ্রবাহের মতো যা ভেসে বয়ে নেচে মেতে চলেছে। এই চলার নিজস্ব গতিময়তা আছে যার সম্বন্ধে কবি বলেছেন: 'সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজস্ব একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস, কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ'('অন্তর বাহির')।

কবির দেয়া সুরের (স্বরলিপির) গন্ডির মধ্যেই এই সৌন্দর্যনৃত্য গায়কের (শিল্পীর) নিজস্ব সৃষ্টি, এবং এই সৃষ্টির সঙ্গে মিলনের জন্যই গানের রচয়িতা হিসেবে কবির সুরসৃষ্টি ও তার সাগ্রহ প্রতীক্ষা এ কবির নিজেরই কথা।

বলা বাহুল্য, এই সৌন্দর্যনৃত্যের প্রেরণা অবশ্যই বিশেষ গানের বিশেষ কাব্যরসটি ফোটানো, সঙ্গীত শিল্পী নিজে যেভাবে কাব্যরসটি ইন্টারপ্রিন্ট করেন সেই ইন্টারপ্রিটেশন অনুযায়ী। সমুদ্রের ঢেউয়ের গতিময়তা যেমন বিচিত্র এবং যেভাবে এ ঢেউ তার নানা বিচিত্র রসের লীলা ছন্দায়িত করে, কখনো শান্ত গভীর দোলায়, কখনো চপল হিল্লোলে, কখনো আকুল উচ্ছ্বাসে, কখনো স্পন্দিত পবনের হাত ধরে টলমল করে খেলায় মেতে, কখনো ঝড়ের মত্ততার সঙ্গে ফুলে উঠে দুরে বিলীন হয়ে গিয়ে, আবার অতল থেকে ভেসে উঠে এসে, সঙ্গীতও তেমনি রচয়িতাদত্ত সুরের প্রাঙ্গণে সঙ্গীতশিল্পীর নানান বিচিত্র রসলীলা, গানের কাব্যরসটি পরিবশনার আমন্ত্রণে। এই রসনৃত্যে যুক্ত হয় দক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে সুরের রংবৈচিত্র্য (শব্দের ধ্বনিবৈচিত্র্য নিয়ে), যেন কবির ভাষাতেই আবার, 'সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে ('জীবনস্মৃতি', সঙ্গীতচিন্তা, পৃ ১৯০)' সবই সেই বিশেষ গানটির (বিশেষ চরণের) কাব্যরসটি চিত্রণের লক্ষ্যেই। সব মিলিয়ে গানের বাণীকে সুরের রসে রঙে পরিবশন করতে যে রূপ সৃষ্টিট হয় তার সৌন্দর্যই এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক থেকে আর এক গায়ককে শিল্পী হিসেবে আলাদা করে পরিচিত করে, শুধু সুরে-তালে গাওয়া বা কণ্ঠমাধুর্য নয়।

আমার মনে হয়েছে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায়, এই সঙ্গীতের গায়কীয় আলোচনায়, কবির কাছ থেকে এই রূপসৃষ্টির স্পষ্ট আহ্বান অবহেলিত হয়ে রয়েছে, যেন স্বরলিপি-নির্দেশিত সুরের গন্ডি অতিক্রম না করার অনুশাসনটিই আলোচকদের বেশি ব্যস্ত রেখেছে। গন্ডীটি দেখানো প্রয়োজন, কারণ এ রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর কোনো সঙ্গীত নয়, কিন্তু এর স্পিরিটটি ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ এটি অনুশাসনের ভাষা না হয়ে আমন্ত্রনের ভাষা হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ তুমি এসো আমার আঙিনায়, তোমার জন্য এঁকে দিয়েছি আমার সুরের আলপনা, তার ওপরে নেচে তোমার সৃষ্টিশীলতা দেখাও, তোমার শিল্পসত্তা চরিতার্থ করো। কবি তো তাই চেয়েছেন। আর যদি তাই না চান তাহলে এসব রচয়িতাকে পেছনে ফেলে সত্যিকারের সঙ্গীতশিল্পী কি এগিয়ে

যেতে চাইবেন না? কারণ কোনো সঙ্গীত রচনা ও গায়কীর নির্দেশনা যদি শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা চরিতার্থের যোগ্য না হয় তবে সেই সঙ্গীতে শিল্পীর আগ্রহ হবে কেন?

সঙ্গীত রচয়িতাদত্ত সুরের সীমার মধ্যে সৃষ্টির লীলা, যা অন্য কথায় বলা যায় অসীমের লীলা, কারন সৃষ্টির কোনো সীমা নেই। রচয়িতা সুরের যে ছক এঁকে দেন তা সসীম, কিন্তু তার রসের, তার সৌন্দর্যের কোনো সীমা নেই। এই রস, এই সৌন্দর্য অনির্বচনীয়, আর এই অনির্বচনীয়টুকুই সঙ্গীত এ কথা কবি বার বার বলেছেন। এই অনির্বচনীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার রূপসৃষ্টিই সব শিল্পের উদ্দেশ্য, তার প্রেরণা। এই প্রশ্নে কবি নিজে কোনো ভূল করেননি, তিনি বরাবর এখানেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক ধারক, শিক্ষক, আলোচক ভূল করেননি এ কথা বোধ হয় বলা যায় না।

আমার এই আলোচনায় ইতি টানবো রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষকতা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে। সত্যিকারের গান গাইতে কাউকে শেখানো যায় না, গান শিল্পীর ভিতরেই থাকে, তাকে মুক্তি পেতে সহায়তা করা যায় মাত্র। অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে গান অনুকরণ করিয়ে যাওয়া এই জন্য ভূল। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার অনেকাংশই হওয়া প্রয়োজন এই সঙ্গীত সম্বন্ধে চেতনা শিক্ষা, আর শিক্ষার্থীকে আহ্বান করা এ গানকে আপন করে নিয়ে তার শিল্পীসত্তা দিযে এতে প্রাণ সঞ্চার করে একে ভাসিয়ে দিতে। আর, কোনো চরণের গায়কী নিয়ে ভাবনা হলে শিক্ষককে নয়, জিজ্ঞেস করতে হবে সাগরের ঢেউকে। এ রকম শিক্ষার পিডাগজি নিয়ে বিস্তর গবেষণা, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হওয়া প্রয়োজন, এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি অভিজ্ঞতা আমার আজকের শেষ নিবেদন। কলিম শরাফীর রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়েছিল কলকাতার একটি বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যায়তনে। এই শিক্ষা নিয়ে তিনি নাট্যকার শম্ভু মিত্রকে গান শোনাতেন, আর শম্ভু মিত্র বলতেন, কী গাইছো, কিছু হচ্ছে না, তুমি তো কম্যুনিকেট করছো না, কথাটি তোমার কথা হচ্ছে না। শম্ভু মিত্রের কাছ থেকে এই নিরন্তর চ্যালেঞ্জেই কলিম শরাফী তৈরি হয়েছেন, তার শিল্পীসত্তাকে বের করে আনবার পিডাগজি ছিল এই। যার ফলে তিনি যখন পরিণত গায়ক (শিল্পী) হয়ে গান করেছেন 'শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি', তখন আমরা সেই নূপুরধ্বনি দূর থেকে পায়ে পায়ে আসা শুধু শুনতেই পাইনি, আবছা দুটি পা নূপুর পড়ে নেচে আসছে এটি যেন দেখতেও পেয়েছি। শম্ভু মিত্রের এই চ্যালেঞ্জটি সব রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের কাছে এবং তাদের শিক্ষকদের কাছে হোক।

বক্তৃতাটি পড়ে স্টেজর ভেতর থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখন শোতাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমাকে প্রণাম করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?" তিনি বল্লেন, "আমাকে আপনি চিনবেন না কিন্তু আমার বাবার নাম শুনে থাকতে পারেন - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর এত সুন্দর বক্তৃতা কখনো শুনি নি, তাই আপনাকে প্রণাম করছি।" 'নবজীবনের গান'-এর রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কথা আমাদের যুগের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মহলে কে না জানে, কিন্তু তিনি যে অসাধারণ রসে মজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন একথা হয়তো অনেকে জানেন না - আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই তিনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশকে তাঁর গান দিয়ে বরণ করে নিতে। তাঁর গান সম্বন্ধে পরে আরো বলবো।

আমার গানের আগে পশ্চিম বাংলা সরকারের কালচারাল ডিরেক্টর কবি কালীকৃষ্ণ গুহ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "এবার আপনি সংগতের জন্য কী কী যন্ত্র নেবেন?" আমি বলি যে একটা খুব জমানো গান করবো ভাবছি - "থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ" - এগানের সঙ্গে বোধ হয় তবলা ভালোই যাবে...উনি তক্ষনি আমাকে বাধা দিয়ে বল্লেন, "আমি তবলার কথা জিজ্ঞেস করি নাই, আপনি গতবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তবলার কোনো দরকার নেই, আপনি এই ধারণাটা ভাঙবেন না। অন্য কী কী যন্ত্র নেবেন বলুন।" আমি বল্লাম, "ধন্যবাদ, আপনি আমার হয়ে তবলার প্রশ্নটা সেট্‌ল্‌ করে দিয়েছেন। আমি আগের বারের মতোই এস্রাজ, বেহালা আর মন্দিরা দিয়ে ছন্দ নেব"।

আমি স্টেজে ঢোকবার আগে তবলা শিল্পী আমার কাছে আসেন, বলেন, "স্যার,আমাকে নেবেন না?" আমি বলি, "ভাই আপনার সঙ্গে তো আমি বসি নি আমাদের দুজনের সমঝোতা হবে কিনা যাচাই করতে। আর পারফরমেন্সটাতো আমার - আমি রিস্ক নিতে চাই না আপনার সঙ্গে সমঝোতা না হয়ে এটা নষ্ট হবার"। তবলা শিল্পী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন - হয়তো তিনি খুব ভালো তবলা বাজান, এবং তাঁর জীবনে এভাবে তাঁকে কেউ ফিরিয়ে দেয় নি।

আমি আধ ধন্টা গাইবার জন্য ছয়টা গান ঠিক করে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে অবশ্যই পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীর অনুরোধ মতো "একদা তুমি প্রিয়ে" গানটি আবার ছিল। গানটির এবার আমার মনগড়া বেশ বড়ো করে ব্যাখ্যা দিলাম: "একদিন তুমি আসতে আমার কাছে সেকথা তুমি ভুলে গেছ, কিন্তু ওই যে নদীর ধারে আমরা দুজনে বসতাম সেই নদীটা এই কথা আজো ভুলতে পারছে না, তার স্রোতে চল্‌ছে, চল্‌ছে সেই মধুর স্মৃতি। আসলে তো আমিই সেই স্মৃতিটা ভুলতে পারছি না, সেই স্মৃতিটা আমাকে হন্ট করে চলেছে করে চলেছে, যেন নদীর স্রোতের অবিরাম ছন্দে ছন্দে বয়ে চলবার মতো। চলবার গতি রবীন্দ্রনাথ অনেক গানেই ঝাঁপ তালের ছন্দে দিয়েছেন, এই গানেও তাই। মাঝে মাঝে ছন্দে প্রথম মাত্রায় আড়ি পড়েছে, যেন জীবনের টানপোড়েনে মাঝে মাঝে এই স্মৃতিটা থমকে যচ্ছে, নদীর স্রোত যেমন পাথর ইত্যাদিতে আট্‌কে যায়, তারপর আবার স্রোত পথ করে নেয় যেন সেই স্মৃতিটা আমার তাজা হয়ে চল্‌তে শুরু করে। এ যেন সেই হন্টিং চলমান স্মৃতিটারই সুরে ছন্দে ছবি আঁকা - এই অসাধারন কাব্যচিন্তার রূপায়নে, শিল্পসৃষ্টির এই লেভেলে, ছবি আঁকা আর গানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কবি এগানে সুরে ছন্দে ছবিই এঁকে চলেছেন।"

গান ছয়টি শেষ করে শ্রোতাদের আদাব দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, সবাই "আর একটা, আর একটা" বলে হৈ হৈ করে উঠলেন। আমি বিণীতভাবে বল্লাম "রাত হয়ে গেছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আপনাদের সকলের বাড়ী যেতে হবে, আমার পরে পীযুষ কান্তি সরকার গাইবেন তাঁর দেরী হয়ে যাচ্ছে তিনি স্টেজে ঢোকবার জন্য এক পা বাড়িয়ে সাইডে অপেক্ষা করছেন, আমার আর গাওয়া উচিত হবে না।" এবার শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটু যেন কঠিন গলাতেই আওয়াজ আসলো, "আপনি তবু আর একটা গাইবেন!" তারপর এক মহিলা কন্ঠের আওয়াজ, "বঁধু মিছে রাগ কোরো না গানটি করুন"। বোঝা গেল তিনি আমার আগের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। করতেই হোল আবার বঁধুর মান-ভাঙানো গানটা। গানটি শেষ করে স্টেজের একপাশের সিঁড়ি দিয়ে পীযুষের গান শোনবার জন্য যখন নীচে নামছি, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে উঠে দাঁড়ালেন, হাত তুলে হৈ হৈ করে বলে উঠলেন, "দাদা, অসাধারণ! দাদা অসাধারণ!" রবীন্দ্রসদনের শ্রোতারা সত্যিই গায়কের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের গভীরে যেতে জানেন!

নীচে নামলে অর্থমন্ত্রী উঠে এগিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যেয়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মাঝখানে জায়গা করে দিয়ে আমাকে মহা সন্মান করে বসালেন।

পীযুষ কান্তি সরকারের গান আমি এর আগে ঢাকায় একবার শুনেছিলাম। আশ্চর্য সৃষ্টিশীল গুণী শিল্পী। সুর-তালের ওপর নিখুঁত দখল, এবং সেই দখল নিয়ে কবির গানের সুর-তাল একেবারে আত্মস্থ করে নিজের করে নিয়ে অসাধারণ সৃষ্টিশীলভাবে গানের কথাগুলি বলেন। কোন কোন লাইন এমন, এমন আশ্চর্য সুন্দর করে ফ্যালেন যে আমি শুনে শুধু মোহিত হয়ে যাই নাই, হিংসা করেছি কই আমি তো ওই লাইনটা অতো সুন্দর করে গাইতে পারি নাই! তবে মনে হোত যেন একটি গানের সামগ্রিক পরিবেশনায় যেন মাঝ-মাঝে ব্যালেন্স রাখতে পারেতেন না, মাঝে মাঝে খুব মৃদু থেকে হঠাৎ বিকট হয়ে উঠতো কণ্ঠস্বর। তাঁর এই দোষের জন্য ‘দেশ’ পত্রিকায় একটি রিভ্যুতে তাঁকে বেশ তিরস্কার করেছিল, যদিও আমার মনে হয়েছিল সেই সমালোচনা বেশি একপেশে হয়েছিল এবং আরো কনস্ট্রাক্টিভ্ সমালোচনা করা উচিত ছিল এই প্রতিভাবান শিল্পীকে সাহায্য করবার জন্য। পীযুষ এই অনুষ্ঠানে গাইতে যেয়েও তাঁর গানের এরকম সমালোচনার কথা বলেন এবং দু:খ করেন। এবং কয়েকটি গানে আবার তাঁর কবির গানকে একবারে আত্মসাৎ করে সুর-তাল নিখুঁত রেখে রসের অসাধারণ গভীর খেলা দেখিয়ে শ্রোতাদের, আমাকে সহ, মোহিত করেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাঁর গান শুনে খুশি হতেন, কারণ তিনি তো বলেছিলেনই যে তাঁর সৃষ্টশীলতার সঙ্গে গায়কের সৃষ্টিশীলতার মিলনের জন্য তাঁর ছিল সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

অনুষ্ঠানের শেষে হোটেলে ফেরবার পথে একই গাড়ীতে আমি ও পীযুষ উঠি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু সে নিজেই গাড়ীতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, “আনিসুরদা, আমার গানের অনেকে সমালোচনা করে, আপনি কী বলেন?” আমি উত্তর দিলাম, “ আমি আপনার গানে যে জিনিসগুলো বিশেষ পছন্দ করি তা হোল আপনি রবীন্দ্রনাথের গানগুলোকে একবারে নিজের করে নেন, আপনি যখন গাইছেন তথন কথাগুলি একেবারে আপনার নিজের কথা বলেই মনে হয়। আর কথাগুলি প্রকাশ করতে আপনার ভাবের খেলা খুবই অসাধারণ এবং অনেক জায়গাতেই ভীষণ সুন্দর। তবে আমাদের সবাইকেই একথা মানতে হবে যে আমি যেভাবে গানের যে চরণ প্রকাশ করছি তা সব শ্রোতাদের একইরকম ভালো নাও লাগতে পারে।” পীযুষ বল্লেন, “তা তো অবশ্যই” ।

ঢাকায় ফেরবার পর আমার এই অনুষ্ঠানেরো রিভ্যু পাই স্টেটসম্যান পত্রিকায় উঠেছিল। আমি জানতাম না যে আমাদের সন্ধ্যাটি ২২শে শ্রাবন উপলক্ষ্যে চারদিনব্যাপী একটি প্রোগ্রামের একদিন ছিল। এই চারদিনের প্রোগ্রামের ওপর রিভ্যুতে মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী লেখেন,

“Two memorable performances made the Rabindra Sadan observance outstanding...” [একজন সুবিখ্যাত গীতা ঘটক, আর একজন বাংলাদেশ থেকে আগত এই অজানা শিল্পী]:

“Anisur Rahman’s foray into Rabindrasangeet was not to perform but to delve deep into the richness of imagery and philosophy of Rabindrasangeet. His recital exemplified what Tagore meant by “rasa” and “darad”...Anisur Rahman’s recital was marked by a rare sensitivity and the capacity to visualize the lyric. The malhar-kanada based “Kothao je udhao holo” was for him the free winging movement of the birds among the clouds. “Ekoda

tumi priye's rhythm blended with the flowing current of the river. He put all the intensity that is possible in two of Tagore's most soul stirring love songs – "godhuli gagane meghe and Tumi rabe nirabe"..." (The Statesman, Kolkata, 22 August '97).

এর পরের বছরের জুন মাসে আবার রবীন্দ্রসদনে যেয়ে গান করবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু মে মাসের শেষের দিকে আমি সস্ত্রীক আমেরিকায় মেয়েদের কাছে চলে যাই বলে এই আমন্ত্রন রাখতে পারি নি।

২০০২.

২০০১ সালে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় পীযুষ কান্তি সরকার অকালে প্রয়াত হন, এবং এই সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃষ্টিশীল প্রতিভার তিরোভাব ঘটে। মনটা খুন খারাপ হয়ে যায়। ২০০২ সালের মার্চে কলকাতায় যেয়ে এক বন্ধুকে জানাই যে পীযুষের সম্বন্ধে কোন সাংবাদিক আমাকে ইনটারভিউ করতে চাইলে আমি তার গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে পারি। পীযুষের প্রোমোটারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন দাঁত চিকিৎসক ও সংস্কৃতি কর্মী ড. বারীন রায়, তিনি এই কথা জানতে পেরে ১৫ই মার্চ পীযুষ স্মরণে তাঁর ওয়াটার্লু স্ট্রীটের বাসভবনে একটা আলোচনা-সহ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাকে 'কথায় ও গানে' এক ঘন্টা দেন। সেখানে গানে আরো ছিলেন উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী স্বাগতা লক্ষ্মী।

আমি আমার আলোচনায় পীযুষের গানের সৃষ্টিশীলতা আলোচনা করি, এবং তারপর গোটা দশেক গান করি। গানগুলির প্রায় সবই আমার স্বভাবমতো কিছুটা ব্যাখ্যা করে তারপরে করি। মাঝখানে দুটো গান কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই করে ফেলেছিলাম, তারপরই একজন শ্রোতার হাত উঠল: "প্লীজ আপনি ওরকম বলে বলে গানগুলি করুন।" বুঝলাম শ্রোতারা গানের আগে একটু ব্যাখ্যা পেলে গানের মধ্যে আরো ডুবতে পারেন। আরেকটি ঘটনা ঘটলো বলবার মতোই: আমি 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটি গাইবার পর একজন শ্রোতার হাত উঠলো: *"আপনি এই গানটি আবার গাইবেন"*! এমন অভিজ্ঞতা আমার আর কখনো হয় নি - গানটা তখনি আবার, একই আসরে পর পর দুইবার, গাইতে হোল! সেই 'প্রিয়ে' যেন সেই নদীর স্রোতের মতো আমাকে হন্ট করেই চলেছে "আমাকে আবার গাও, আমাকে আবার গাও" বলে!

২০০৩

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আমার সঙ্গীতজীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়:

আমার দুই কন্যা আমেরিকায় থাকে, এবং তারা আমাকে বলে "আব্বু তোমার গান আমরা রাখতে চাই, তুমি টেপ্ করে পাঠাও"। আমার তখনো আমার গানের ফরমাল রেকর্ড করবার কথা মনে হয় নি, শুধু

কন্যারা চায় দেখে একটা সফ্‌টওয়ার জোগাড় করে বাসাতেই আমার নিজের পি,সিতে শুধু হারমোনিয়াম দিযে এবং পরে তানপুরার আওয়াজ মিক্স-পেস্ট করে কয়েকটা গান করে একটা সিডি করে ফেল্লাম। কন্যাদের কাছে যাওয়া ছাড়া কিছু বন্ধু-বান্ধবের হাতে হাতেও ওটা ঘুরতে থাকলো। এক সময় হঠাৎ ডি-নেট বলে একটি গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর আমার কাছে এসে বল্লেন যে তিনি ও তাঁর বাবা সিডিটা শুনে ভীষণ পছন্দ করেছেন, এবং ডি-নেট এই সিডিটা আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ করতে চায়। একই সঙ্গে ডি-নেট "গুণীজন" বলে একটা ওয়েব্‌সাইট প্রোগ্রাম নামাতে চায় বিভিন্ন মঞ্চে দেশের কৃতি ব্যাক্তিদের তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য, এবং আমাকে দিয়েই তারা এই "গুণীজন" প্রেগ্রামটিও শুরু করতে চায় আমার সিডি লঞ্চিং-এর সঙ্গে একই দিনে। ২১শে মার্চ ২০০৩ সালে ডি-নেট আমার সিডি ও "গুণীজন" প্রোগ্রামটি একই সঙ্গে আলিয়াস ফ্রাঁসে-তে লঞ্চ করে, এবং আমি আমার সঙ্গীতজীবনে নিজের দেশে এই প্রথম একটি সত্যিকারের পাবলিক মঞ্চে একক গান পরিবেশন করি। আর সঙ্গে সঙ্গে গুণীজন প্রোগ্রামও লঞ্চ করা হয় আমাকেই প্রথম সমাজ-বিজ্ঞান ও সঙ্গীত উভয় বিষয়ে "গুণীজন" ঘোষণা করে।

সমাজবিজ্ঞানে না হয় প্রথম "গুণীজন" হলাম, অর্থশাস্ত্রে এবং পার্টিসিপেটরি উন্নয়নশাস্ত্রে আমার আন্তর্জাতিক পরিচিতি মোটামুটি খারাপ নয়, কিন্তু একটু-আধটু গান করি বলে সঙ্গীতেও? এর পরে সঙ্গীতে বারীন মজুমদারকে গুণীজন করা হলে এবং আমার পরে তাঁর নাম দেয়া হলে আমি মহা লজ্জা পেয়ে ডি-নেটকে বলি যেন সঙ্গীতে গুণীজনের লিস্টে আমার আগে তাঁর নাম দেয়া হয়। আরো বলি যে এভাবে এলোপাথারি "গুণীজন" সিলেক্ট না করে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জুরি বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন যে বোর্ড সুচিন্তিত কতগুলি বিচারনীতি অনুযায়ী "গুণীজন" নির্বাচন করবে। পরবর্তীতে ডি-নেট সঙ্গীতে গুণীজন হিসাবে বারীন মজুমদারের নাম আমার আগে দেয়, এবং আমার কাছ থেকে জুরী বোর্ডের সদস্যদের নামের প্রস্তাব নিয়ে এক জুরী বোর্ড গঠন করে।

এর পরে এপ্রিলের প্রথম দিকে কলকাতায় যাই। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা সুস্মিতা যাঁর সঙ্গে ১৯৯৭ সালের ২২শে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদনের স্টেজে দেখা হয়েছিল আমার বক্তৃতার পর, তাঁর স্বামী দেবাশীষ রায় চৌধুরি ইংরেজীর অধ্যাপক, দক্ষিণী থেকে পাশ করা রবীন্দ্রসঙ্গীতে গ্রাজুয়েট, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পুরানো দিনের বাংলা গান ইত্যাদি নিয়ে বেশ কয়েকটা রেকর্ড করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের 'নবজীবনের গান' গীতা ঘটককে মূল ভূমিকায় নিয়ে অপেরা পরিচালনা করেছেন, আরো রবীন্দ্র গীতিনাটকের পরিচালক ইত্যাদি বহু গুণের অধিকারী অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা একজন ব্যাক্তিত্ব - তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় আমার স্ত্রীর বান্ধবী প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপিকা দেবাশীষ রায় চৌধুরিরও শিক্ষক শীলা লাহিড়ির বাসায়। সেখানে আমরা দুজনে কয়েকটা গানও বিনিময় করি। পরে দেবাশীষ রায় এক সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় আমার গানের আয়োজন করেন। শ্রোতৃমন্ডলিতে ছিলেন তাঁর গ্রুপের ও বাইরের জনা তিরিশেক গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রী। গায়ক-গায়িকারা প্রায় সকলেই কলকাতার বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলের - দক্ষিণী, গীতবিতান ইত্যাদি - পাশ করা গ্রাজুয়েট যাঁদের কারো কারো ক্যাসেটও বেরিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যার বাসায় গান করা আমার জন্য একটি ইমোশনাল ঘটনা। তার কারণ শুধু যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তাই নয়, আরো একটি কারণ ছিল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় একটি বাসায় সন্ধ্যাবেলা কলিম শরাফির গান শুনতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে একটি গান আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলে এসেছিল আমি সারারাতে ঘুমোতে পারি নি, সারারাত গানটি আমাকে হন্ট করেছিল - গানটি 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে'। কলিম শরাফির এই গানটি

গাইবার স্টাইল রেকর্ডে ও অন্যান্যদের কণ্ঠে এই গানটি যেভাবে একটু চটুল করে গাওয়া হযেছে ও হয় একেবারেই তা নয়, অনেক গভীরভাবে ঘুমের ঘোরে বৃষ্টি এসে আমার স্বপ্নস্বরূপকে নিয়ে মেঘলোকে কোথায় নিয়ে গেল সেই স্টাইল। অনেক বছর পরে কলিম শরাফিকে তাঁর এই গানটি আমার কী আবস্থা করে দিয়েছির সেকথা বলেছিলাম, কলিম শরাফি তখন বলেছিলেন তিনি এই স্টাইলটি পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছ থেকে, এবং প্রথম যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে এই গানটি শোনেন সেদিন এই গানটি তাঁরও সঙ্গে তাঁর বাসায় চলে গিয়েছিল। সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যার বাসায় গান গাইতে গেছি! আমি তাঁর অসাধারণ স্টাইলের ‘আমি তখন ছিলেম মগন’ গানটি কলিম শরাফির ও কলিম শরাফির মাধ্যমে আমার কী অবস্থা করেছিল সেকথা বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে এই গানটি দিয়েই আমার নিবেদন শুরু করি।

দেড় ঘন্টাব্যাপী গোটা পনেরো গান গেয়ে যখন স্টেজ ছেড়ে শ্রোতাদের কাছে যাই তখন শ্রোতারা আমাকে ঘিরে ফেলে বল্লেন, “আপনি তো গান করলেন না!” আমি অবাক্ হয়ে বল্লাম, “এই দেড় ঘন্টা ধরে তাহলে কী করলাম?” তাঁরা বল্লেন, “ছবি আঁকলেন!” তারপর তাঁরা বল্লেন, “আমাদের শেখাতে হবে। আমি বল্লাম, “আপনারা তো সবাই বিভিন্ন নামকরা গানের স্কুলে গান শিখেছেন, আমার কাছে আবার কী শিখবেন?” তাঁরা বল্লেন, “গান সম্বন্ধে আপনার সৌন্দর্য-বোধ, আর এই বয়সে এই কণ্ঠ কেমন করে রেখেছেন।” আনেক শিখেও তাঁদের আরো শেখবার এই আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করলো, এবং আমি তাঁদের সঙ্গে বসতে রাজী বলে জানালাম।

দিন দুই পর একজন বন্ধু বার্তা পৌঁছে দিলেন যে পাটনার ’রবীন্দ্র পরিষদ’ সপ্তাহ দুইব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করবে, এবং তারা আমাকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে ও প্রথম দিনে গান করতে আমন্ত্রণ করছে। আমি ৭ই মে রাতের ট্রেণে পাটনা গেলাম। পাটনায় বহু বাঙ্গালি অধিবাসী, এবং ভারত সরকারের অনুদান নিয়ে তৈরী এক বিরাট কমপ্লেক্স রবীন্দ্র পরিষদের জন্য। সেখানে ঢুকেই কবির এক বিরাট কোমর পর্যন্ত মূর্তি, একটি বিরাট অডিটোরিয়াম অনুষ্ঠানাদির জন্য, আরো বিভিন্ন ছোট বড়ো ঘর ও ট্রেনিং সেন্টার গান, নাচ, নাটক ইত্যাদির চর্চার জন্য। ৮ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনে আমি প্রধান অতিথি হয়ে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলাম এবং সবার বক্তৃতা শেষ হলে শুধু হারমোনিয়াম বাজিয়েই বেশ কয়েকটা গান করলাম। সে গান যে কীভাবে তারা গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রশংসা যে মামুলি ভদ্রতা ছিল না তা বুঝতে পারি পরের বৎসর, যে কথা পরে।

পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরলে দেবাশীষ রায় চৌধুরির বাসায় যাদের গান শুনিয়েছিলাম এবং যারা আমার সঙ্গে বসতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে একটি গ্রুপ সল্ট লেক সিটিতে কবি কালীকৃষ্ণ গুহের বাসায় এক সন্ধ্যা আমাকে নিয়ে যায়। সুগায়িকা সুমিতা দাস এই গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যা। সল্ট লেক সিটিতে তাদের একটি সাংস্কৃতিক দল আছে সেই দলের জনা বিশ-পঁচিশ জন আমার সঙ্গে বসে আমার কাছ থেকে আমার গানের স্যেন্দর্যচেতনা সম্বন্ধে এবং আমার কণ্ঠসাধনা পদ্ধতি জানতে চায়। সেই আসরে সল্ট লেকের বাসিন্দা কবি শঙ্খ ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘন্টা চারেক আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং তারা সমস্ত আলোচনাটি টেপ্ করে রেখেছিল। আমি রবীন্দ্রনাথেরই গানের সৌন্দর্যচেতনা আলোচনা করি যে বিষয়ে তিনি গানের সৌন্দর্যপ্রবাহকে সমুদ্রের ঢেউএর সৌন্দর্যনাচের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমার আলোচনার মধ্যে মধ্যে আমি আমার পার্টিসিপেটরি দশন অনুযায়ী শ্রোতাদেরও আমার বক্তব্য পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে বলি তাদের উপলব্ধি দৃঢ়তর করবার জন্য। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরস্পরকে আমার বক্তব্য বেশ সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেয়। কিন্তু একজন

মহিলা বারে বারে হাত তুলে বলতে থাকেন তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না আমি আমার প্রত্যেকটি কথা গেয়ে বুঝিয়ে না দিলে। আমি বেশ অবাক হই তিনি কেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলে আমি গৃহস্বামী (ততক্ষণে সবার মতো আমারো তিনি "কালী দা" হয়ে গিয়েছেন) ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করি ওই যে ভদ্রমহিলা বারে বারে বলছিলেন কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি কে। উত্তর পেলাম তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। আমাকে যেন একটা ঐতিহাসিক সত্য নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মারলো - বাংলাদেশের শিল্পীরা কী সঙ্গীতের সৌন্দর্যের আলোচনা সহজে বুঝতে পারেন না? কেউ কেউ নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যে আলোচনা অনেক শিল্পীই সহজেই বুঝতে পারেন বাংলাদেশের শিল্পীদের বেলাতে এটি কী একটি ব্যতিক্রম?

সল্ট লেক সিটির গ্রুপটি ছাড়া যাদবপুরের আর একটি গ্রুপ যাদের অনেকে দেবাশীশ রায় চৌধুরীর বাসায় আমার গানের অনুষ্ঠানে ছিল তারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে আমার সঙ্গে আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞান নিয়ে বসতে চায়। আমি বলি যে পরের বার কলকাতায় আসলে তাদের সঙ্গে বসবো।

দেশে ফেরবার আগে 'তারা বাংলা' টেলিভিশন স্টেশন আমাকে আর প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দ্বিজেন মুখার্জিকে তাদের 'মুখোমুখী' প্রোগ্রামে বসিয়ে দেয় যে প্রোগ্রাম অনেকেই দেখেছেন। দ্বিজেন মুখার্জীর সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়, এবং এত বড়ো মাপের সঙ্গীতশিল্পী হয়ে তাঁর অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হই। আমরা দুজনে দুই বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা নিয়ে আলোচনা করি। এক সময় দ্বিজেন মুখার্জি আমাকে একটি গানের কযেকটি লাইন গাইতে অনুরোধ করলে আমি "তুমি কী কেবলি ছবি" গানটি থেকে কয়েকটি লাইন করি। পরে আমি দ্বিজেন মুখার্জিকেও একটু গান করতে অনুরোধ করলে তিনি "শুধু তোমার বাণী" থেকে কয়েকটি লাইন করেন। পরম দু:খের বিষয় এই প্রোগামটি ব্রডকাস্ট করবার সময় "তারা বাংলা" আমার গানটি রেখে দ্বিজেন মুখার্জির গানটি বাদ দিয়ে দেয় - অন্ততঃ আমি ব্রডকাস্টে দ্বিজেন মুখার্জির গানটি শুনি নি - যা আমার কাছে অত্যন্ত অশোভন ও দুংখজনক লেগেছিল - দ্বিজেন মুখার্জি সঙ্গীত জগতে 'পুরোনো' হয়ে গিয়েছেন বলে কী তাঁকে শুধুমাত্র একটি নতুন মুখ প্রেজেন্ট করবার জন্য এইভাবে 'ব্যবহার' করতে হবে? 'বাজারের' কাছে কী সবাইকে এমভিাবেই আত্মসমর্পন করতেই হবে?

২০০৪

পরের বছর আবার আসছে ২৫শে বৈশাখ। ভাবছিলাম ওপার বাংলায় যাব নাকি কবিকে স্মরণ করতে। এপারে তো সেরকম সুযোগ হয় না। এপ্রিলের শেষের দিকে পাটনার রবীন্দ্র পরিষদ থেকে ই-মেল এল। আমি কী পঁচিশে বৈশাখে ওদের কাছে যেতে পারবো? ওরা একটি পুরষ্কার দেয় দু-বছর পর পর। "রবীন্দ্র পুরষ্কার"। এর আগে পুরষ্কারটি পেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র, তার দু বছর পরে সুবিনয় রায়, তার পর দ্বিজেন মুখার্জি। এবছর তাদের বোর্ড এই পুরষ্কারটি আমাকে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবাক হই - মাত্র একদিন তাদের ওখানে যেয়ে গান করেছি আগের বছর। চাল নেই, চুলো নেই (ক্যাসেট নেই, সিডি নেই!) "এ মণিহার [তো] আমায় [একেবারেই] নাহি সাজে"! কিন্তু 'না' করে তাদের - বা রবীন্দ্রনাথকেই - অসন্মান করি কী করে? চলে গেলাম কলকাতা হয়ে পাটনায়। যাবার সময় কলকাতায় যাদবপুরের সেই গ্রুপটিকে জানিয়ে দিলাম যে তারা যদি চায় আমি পাটনা থেকে ফিরে আসলে তাদের কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর একটা ওয়ার্কশপ দিতে পারি।

বিহারের গভর্ণর শ্রী এম, রামা জয়েস পুরষ্কারটি আমার হাতে তুলে দেন। তারপরে ঘন্টা দেড়েক গান করি আমার স্টাইলে শুধু হারমোনিয়াম দিয়েই। গান শেষ হলে এক বয়স্ক ভদ্রলোক স্টেজে উঠে এসে আমার দুটো হাত ধরে বলেন, “আমি এতদিন শুনতাম রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের মিলন; কিন্তু ব্যাপারটা বুঝি নি। আজ বুঝলাম।” আর এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা স্টেজে উঠে এসে আমাকে প্রণাম করে বল্লেন, “শুধু হারমোনিয়াম দিয়ে যে এরকম সুন্দর গান হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।”

পরের দিন সকালে রবীন্দ্র পরিষদ আমাকে নিয়ে একটি ওয়ার্কশপের মতো আয়োজন করেছিল ওখানকার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। নানান বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা কী আলোচনা করতে চান। একজন সিনিয়র শিল্পী বল্লেন, “তবলা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত এত সুন্দর হতে পারে একথার আলোচনা কোথায় পাবো?” আমি বল্লাম, “রবীন্দ্রনাথের ‘সংগীতের মুক্তি’ প্রবন্ধটা পড়েন নি? উনি তো তবলার ওস্তাদিয়ানা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। আর সত্যজিত রায়ের ‘রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা’ প্রবন্ধেও তো একই কথা বলেছেন অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই মনীষি”। তারা পড়ে নি - গভীর দু:খের বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে রবীন্দ্রনাথের ‘সঙ্গীতচিন্তা’ না পড়েই। আরো জানলাম তাদের শিক্ষক শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের পাশ করা সঙ্গীতে এম,এ। ওয়ার্কশপ শেষে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই এবং তিনিও যথারীতি ঘটা করে আমাকে একটা প্রণামও ঠোকেন।

কলকাতায় ফিরলে ১৬ই মে রবিবার যাদবপুরের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি ‘সঞ্চারী কলাকেন্দ্রের’ আয়োজনে যোধপুর পার্কের কৌশিক হলে সারা দিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ দেই আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর।ওরা আনন্দবাজার পত্রিকায় এসম্বন্ধে ঘোষণা দিয়েছিল। মোট ৪৫ জন সঙ্গীতশিল্পী - সঙ্গীত ডিরেক্টর দেবাশীষ

রায় চৌধুরি সহ - এবং নাট্য-অভিনেতা-অভিনেত্রী ওয়ার্কশপটি এটেন্ড করেন শুধু নয়, খাতা-কলম হাতে সারা দিন চক্-চকে চোখ নিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে থাকেন নতুন জিনিষ শেখবার জন্য। ওয়ার্কশপ শেষে তারা প্রত্যেকে আমার কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিলে আমি বলি-যে আমিও-তো ওয়ার্কশপ এটেন্ড করেছি, আমার সার্টিফিকেট কই? তখন তারা একটা সার্টিফিকেটের পেছনে সকলের অটোগ্রাফ দিয়ে আমাকে উপহার দেয় যেটা আমার জন্য একটা মহা মূল্যবান স্মৃতি-উপহার হয়ে আছে।

দেশে ফিরে 'রবীন্দ্র পুরস্কারের' কথা নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের এবং আমার গানের বিশেষ কয়েকজন শ্রোতা ছাড়া আর কাউকে তেমন বলি নি। বন্ধু ও আত্মীয় মহলের কারো কারো কাছ থেকে চাপ এসেছিল সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে - এটা তো একটা ন্যাশনাল নিউজ। কিন্তু আমি তো এর আগে আমার রবীন্দ্রসদনে গানের ওপর স্টেটসম্যানের রিভ্যু-এর কপি এক অগ্রণী পত্রিকার সম্পাদককে পাঠিয়েছিলাম নিজে ফোন করে - সেটা তো মনে হয় তাঁর টেবিলে অনেক কাগজের নীচে চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। একটি সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আমার বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়া খবরটা জানতে পেরে আমাকে ফোন করে এসে প্রায় জোর করেই পুরস্কারটা সম্বন্ধে সব কাগজপত্র নিয়ে যান । তারপর তার কাগজে খবরটি ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের দর্শনের প্রচারের জন্য আমাকে এই পুরস্কারটি দেয়া হয়েছে বলে। সঙ্গীতের কথা কিছু তাতে বলা হয় নি। এদেশে তো রবীন্দ্রসঙ্গীত মহলে অন্যান্য অনেক মহলের মতো অনেক রাজনীতি আছে, সরকার পক্ষ আছে, বিরোধী দলও আছে। আমি কোন্ পক্ষে এটি না জেনে, কিম্বা 'সরকারী পক্ষের' ক্লিয়ারেন্স না নিয়ে, আসল কথাটা কী চট্ করে ছাপা যায়?

আমার এই বয়ান শেষ করছি আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিবেদনের ওপর দুই বাংলার দুজন গভীর বোদ্ধা শ্রোতার মন্তব্য দিয়েঃ

কলকাতার একটি এম,এ ডিগ্রী করেজের ইংরেজীর অধ্যাপিকাঃ
"আমরা যখন হেমন্ত, সুচিত্রা ইত্যাদি গায়ক-গায়িকাদের গান শুনি, তখন সব সময়েই মনে থাকে যে অমুকের গান শুনছি। আপনার বেলায় যেন গায়ক অনুপস্থিত, যেন শুধু রবীন্দ্রনাথের গান শুনছি। এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর কখনো হয় নি।"

ঢাকার অদূরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকের অধ্যাপক (আমার গানের ওপর কমেন্ট বুকে লিখিত মন্তব্য):
"মনে হল, গানের সঙ্গে কবিও বাহিত হলেন, গায়ক কি পারেন তারপরও যেতে আলোকভুবনে। সুর বাহিত হবে, বহনকারী যাবে পিছিয়ে"!

মন্তব্য দুটির মধ্যে যেন একটা যোগসূত্র আছে, যেন একই কথা দুভাবে বলা হচ্ছে, দু-পারে। আর দুটোই রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতাদের গভীরতার পরিচায়ক, যে গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারাই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের সাধনা হতে পারে।

এর পরবর্তী কাহিনী 'শান্তিনিকেতনে কণ্ঠবিজ্ঞানের অভিসার' শিরোনামে আগেই প্রকশিত হয়েছে (১১-১২ মে, ২০০৬, *দৈনিক সংবাদ,* সম্পাদকীয় পাতা,এবং ওয়েবসাইট www.anisurrahman,com)

জুন ২০০৬